14 JUL 2016

কালের কণ্ঠ

ড. হুমায়রা ফেরদৌস ▷

ক্যাম্পাস রাজনীতিমুক্ত কিন্তু জঙ্গিমুক্ত নয়

সার্বিকভাবেই দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিযুক্ত, রাজনৈতিকভাবে অসচেতন ও রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞাত একটা বিশাল জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যাদের মগজ ধোলাই বা ব্রেনওয়াশ করা অতি সহজেই সম্ভব, ধর্ম বা যেকোনো কিছুর নাম দিয়েই সেটা সম্ভব। মূলত ছাত্র অপরাজনীতি নিয়ে আমাদের দুই দশকের ভীতি আজ এই পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এ কথা ভুলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই যে সেই ভীতির কারণেই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আমাদের বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে এবং সেই শূন্যতায় স্থান করে নিচ্ছে উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ। একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে টিএসসিতে রাজনীতি ও সমকালীন বিশ্ব নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় তুলত আড্ডায় বসে, তার মাধ্যমেই ভবিষ্যতের নেতা পাওয়া যেত

নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যখন এসএসসি ও এইচএসসিতে মেধা তালিকাভিত্তিক পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তখন স্ট্যান্ড করা ছেলে বা মেয়েকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করা হতো, ভবিষ্যতের লক্ষ্য কী বা দিনে কতক্ষণ পড়াশোনা করেছ, পড়াশোনার অনুপ্রেরণা কে ইত্যাদি। এর সঙ্গে যে প্রশ্ন অবধারিত ছিল সেটি হলো ছাত্ররাজনীতি করা উচিত কী উচিত নয়? এ নিয়ে তার ভাবনা কী?

ছাত্রছাত্রীদের উত্তর কী ছিল সেটা মনে করার আগে সে সময়ের কথা আরেকটু বিস্তারিতভাবে মনে করে নিতে হবে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের প্রায় সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ খুবই উত্তাল, অশান্ত। পত্রপত্রিকা খুললেই শুধু ছাত্রদের লাশের ছবি, ক্যাম্পাসে বই-কলম-খাতা দেখার বদলে একদম প্রকাশ্যেই চলে খুনোখুনি, দলাদলি আর টেন্ডারবাজি। ক্যাম্পাসের আকাশে-বাতাসে গুলির আওয়াজ, আর হলে হলে চলছিল হল দখলের এক নির্মম-নির্দয় লড়াই।

সেশনজটের কারণে তখন ছাত্রছাত্রীদের অনেক বেশি সময় লেগেছে পাস করে বের হতে। কিভাবে স্বাবলম্বী হয়ে মা-বাবা, ভাইবোনের পাশে নির্ভরতার প্রতীক হয়ে দাঁড়াবে—সব ছাড়িয়ে এই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয়।

সেই নেতিবাচকতা থেকে এসেছে রাজনীতির প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণা, বিতৃষ্ণা থেকে পরে জন্ম নিয়েছে বিকল্প খোঁজার চিন্তা। প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বেসরকারি মালিকানায় চালিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়। আর ইংরেজির প্রতি মারাত্মক দুর্বলতা থেকে সমাজে জায়গা করে নিয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। সচ্ছল পরিবারের সন্তানদের এসব জায়গায় পড়ানো দিনে দিনে হয়ে গেছে সোশ্যাল স্ট্যাটাস-সিম্বল। এক শ্রেণির মানুষের কাছে ব্রিটিশ বা আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজি বলতে পারাটাই হয়ে উঠেছে জ্ঞানী হওয়ার সবচেয়ে বড় মাপকাঠি।

আর ঠিক তখন থেকেই সমাজ বা দেশের রাজনীতিতে শিক্ষিত সমাজের সম্পৃক্ততা একেবারেই হারিয়ে গেল। আরো বৃহৎ পরিসরে বললে রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করল এ দেশের চালিকাশক্তি বলে খ্যাত শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজ।

এ পরিস্থিতি ধীরে ধীরে এমন হয়ে উঠেছে যে এখন ঘরোয়া আড্ডায়ও যদি কেউ রাজনীতি বা সমকালীন বিশ্ব বা বৈশ্বিক রাজনীতি নিয়ে সামান্যতম আলাপ করে তার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়, 'তুমি রাজনীতিসচেতন' বলে রীতিমতো কৌতুককর দৃষ্টি দিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয়, ক্রমাগত তির্যক বাক্যবাণে তাকে কোণঠাসা করে দেওয়া হয়।

সবাই নিতানতুন প্রযুক্তি, নতুন ফ্যাশন, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সিনেমা নিয়ে আলোচনা করে যেতে পারবে কিন্তু দেশপ্রেম, সমাজ সচেতনতা, নীতিনির্ধারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাবে না। রাজনীতির কথা আসলেই 'আই হেট পলিটিক্স' বলে দূরে থাকতে হবে আর দিনের পর দিন এই দূরে থাকাকেই মহিমান্বিত করে যেতে হবে। কি দারুণ বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের! একেবারে তুলনাহীন!

কিন্তু এতে করে ক্ষতিটা আদতে হয়েছে কার বা আসলেই কি রাজনীতি থেকে দূরে থাকা যায়? না থাকা উচিত? তাতে লাভের গুড় আসলে কে খায়? এর উত্তর এখন খুঁজতে হবে এবং সে মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে হবে। হবেই। তাহলেই এই যে কিছু ক্যাম্পাস থেকে জঙ্গিবাদের উত্থান, সেটা রোধ করা হয়তো সম্ভব হবে।

রাজনীতির মূল বিষয়টা আসে প্রতিনিধি নির্বাচনের পরে। প্রতিনিধিদের মেধা ও যোগ্যতা যদি থাকে, তাহলে তারা জনগণের জন্য ও জনকল্যাণের জন্য কাজ করতে পারবে এবং জনগণকেও প্রতি মুহূর্তে এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে যেতে হবে এবং কোনো নীতিতে ভুল হলে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে, দাঁড় করাতে পারতে হবে। এক নয় একাধিকবার, যতবার দরকার মনে হবে ততবার। এখন যদি প্রতিনিধি নির্বাচনে ভুল হয়, তাহলে এই ভুল নির্বাচনের দায়ভার জনগণকেই বইতে হবে। কিন্তু সরাসরি রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে এই ক্ষমতা যদি দেশের জনগণ প্রয়োগ করতে যায়, নিজেদের আগের কোনো অভিজ্ঞতা ছাড়া, তাহলে শুধু কোনো দেশের নিরাপত্তা নয়, সমগ্র সভ্যতাই বিপদে পড়ে যেতে পারে, এ জন্য সামাজিকীকরণের প্রথম ধাপ পরিবার ও দ্বিতীয় ধাপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এই গুরুদায়িত্বগুলো পালন করতে হয় তাদের রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে, রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করে। 'আই হেট পলিটিক্স' বলে রাজনীতি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নয়। এটাই সমগ্র বিশ্বের রীতি।

কোনোভাবেই পরিবারের ও 'রাজনীতিমুক্ত' শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বলে এই দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এই দায়িত্ব পালন করছে কি? বা আমাদের শিক্ষিত সমাজ কি এই দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত? না নিচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা, যারা পড়াশোনা করেছে একটা রাজনীতিবিহীন পরিবেশে এবং 'আই হেট পলিটিক্স' বাণী ধারণ করে মনেপ্রাণে তারা কি আদতেই যোগ্য নেতা খুঁজতে পারবে?

হ্যাঁ, নেতা হতে পারা নয়, নিজেদের মধ্যে নেতা খুঁজতে পারার গুণ আছে কি না সেটাই জানা প্রয়োজন, এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সে চর্চাই প্রতিনিয়ত চালিয়ে যেতে হয়।

আর এর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত জায়গা হলো ছাত্রছাত্রী ইউনিয়ন বা student Union বা ছাত্র সংসদ। লক্ষ করলে দেখা যাবে মাদ্রাসা, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোটাতেই ছাত্রদের কোনো সমস্যা নিয়ে কথা বলার কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই, কোনো সমস্যা হলে অ্যাডহক ভিত্তিতে সেটা প্রশাসক দিয়ে মেটানোর চেষ্টা করা হয় ঠিকই কিন্তু একটা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে নেতা খুঁজতে পারার ও একজন নেতার অধীনে কাজ করার যে পদ্ধতি ছাত্র সংসদের মাধ্যমে নিয়মিত বিরতিতে অর্জন করা যায়, সে ব্যাপারটাই বর্তমানে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বা সে রকম কোনো প্রতিষ্ঠানে ভয়াবহ রকম অনুপস্থিত। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাকসু, চাকসু-রাকসুর পৌরবময় ঐতিহ্য আছে বটে কিন্তু সেগুলো বর্তমানে খুব কার্যকর নয়, তবে এ কথা ঠিক যে ঐতিহ্যগতভাবে ও বেশির ভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান ও মানবিক শাখার কিছু বিষয় থাকার কারণে সেখানে এ ধরনের ধর্মকেন্দ্রিক জঙ্গিবাদের উত্থান তুলনামূলক কিছু কম। তবে তাতেও খুব বেশি আশান্বিত হওয়ার কিছু নেই। সার্বিকভাবেই দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিযুক্ত, রাজনৈতিকভাবে অসচেতন ও রাষ্ট্রকাঠামো সম্পর্কে অজ্ঞাত একটা বিশাল জনগোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, যাদের মগজ ধোলাই বা ব্রেনওয়াশ করা অতি সহজেই সম্ভব, ধর্ম বা যেকোনো কিছুর নাম দিয়েই সেটা সম্ভব। মূলত ছাত্র অপরাজনীতি নিয়ে আমাদের দুই দশকের ভীতি আজ এই পরিস্থিতিতে নিয়ে এসেছে; কিন্তু এ কথা ভুলে যাওয়ার কোনো উপায় নেই যে সেই ভীতির কারণেই নেতৃত্বের ক্ষেত্রে আমাদের বিরাট শূন্যতা তৈরি হয়েছে এবং সেই শূন্যতায় স্থান করে নিচ্ছে উগ্রবাদ ও জঙ্গিবাদ।

একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে টিএসসিতে রাজনীতি ও সমকালীন বিশ্ব নিয়ে যে বিতর্কের ঝড় তুলত আড্ডায় বসে, তার মাধ্যমেই ভবিষ্যতের নেতা পাওয়া যেত। কালের বিবর্তনে সেই আড্ডার অবস্থান এখন ধানমণ্ডি-গুলশান-বনানী-বারিধারা-উত্তরায়। আরো নির্দিষ্ট করে বললে কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ওই এলাকাগুলোয় অবস্থিত ক্যাফে ও রেস্তোরাঁয়। অবশ্য আড্ডা এসব জায়গায় পৌঁছে গেলেও বিষয়বস্তুতে ও ভাষাগতভাবে আগের আড্ডার তুলনায় ভিন্নতা আছে।

ক্ষুরধার যুক্তিসম্পন্ন বাংলা ভাষার ব্যবহার এই আড্ডায় নেই, বাংলিশ ও করতাসিলাম, গেসস গা বা মাইরা ফালাইমু মামা—এ-জাতীয় ভাষায় চলা এসব আড্ডায় আর যাই হোক সমকালীন বিশ্ব বা রাজনীতি থাকে না। থাকার কারণ নেই। কারণ এই নতুন জায়গাগুলোয় খুব শক্ত করেই লেখা আছে ছাত্ররাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস এগুলো। ক্যাফে বা রেস্তোরাঁর আড্ডাগুলোয়ও রাজনীতি একেবারেই নেই।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, সমকালীন বিশ্ব ও বাংলাদেশ সম্পর্কিত কোনো কিছুই তো আর রাজনীতিবিহীন নয়। তাই যদি সত্যি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে চাই, তাহলে তাদের সঠিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে। কেউ আই হেট পলিটিক্স বললে তাকে বোঝাতে হবে সব কিছুই পলিটিক্স বা রাজনীতির অংশ, ইন্টারনেট বা মোবাইলের ব্যবহার জনগণ বাড়াবে বা কমাবে কি না এটাও দেশের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। তাই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে সঠিক রাজনীতি করা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে নেতৃত্ব চিনতে পারার ক্ষমতাই তারুণ্যের শক্তি, অন্য কিছু নয়।

নইলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাস শুধুই রাজনীতিমুক্ত হবে কিন্তু জঙ্গিমুক্ত নয়।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ,
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)